করোনা আবহে মনোবল বাড়ানোর উপায় কী ?
শ্রীরামকৃষ্ণ এবিষয়ে কি বলেছেন ?

২০২০ সালটি বিগত সহস্র বছরের মধ্যে একটি ব্যাতিক্রমী বছর। বিগত এক হাজার বছরে পৃথিবীতে অনেক বিপর্যয় এসেছে, কিন্তু বর্তমান বছরে পৃথিবীতে এমন একটি বিপর্যয় এসেছে এবং সেই সূত্রে এত বেশি জীবনহানি ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে, যার পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। বস্তুত ২০২০ সালে করোনাসূত্রে যত জীবনহানি ঘটেছে তার তুল্য জীবনহানি পৃথিবীর বুকে সংঘঠিত কোন বিশ্বযুদ্ধেও ঘটেনি, এমনকি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক যুগে বিখ্যাত মহাযুদ্ধগুলিতেও নয়। পূর্ব-পূর্ব যুগে যুদ্ধের বিপর্যয় প্রায়শই যুদ্ধের পরেই সমাপ্ত হয়ে যেত, কিন্তু ২০২০ সালে সংঘঠিত করোনা বিপর্যয়ের রেশ কতদিন থাকবে কেউ জানে না। জীবনহানির সঙ্গে সঙ্গে করোনা আরেক বিপর্যয় পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে। এক বছর ধরে সারা পৃথিবীর মানুষকে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে দিয়েছে । এর ফলে নানা আধি-ব্যাধি এসে মানুষকে আক্রমণ করছে। তার মধ্যে একটি বড় ব্যাধি হচ্ছে মানসিক ব্যাধি বা ডিপ্রেশন। আগে আমরা দেখতাম, পাখিরা আকাশে ওড়ে, মানুষও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। পাখিরা অবশ্য এখনো আকাশে ওড়ে, কিন্তু করোনার কারণে মানুষ এখন আপন গৃহে বন্দি। মানুষের এই গৃহ-বন্দিত্ব এখন বৈশ্বিক একটি বৈশিষ্ট্য। গৃহবন্দিত্ব মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে বাধ্যতামূলক। স্বাধীনতা মানুষ চায়। মানুষ, পশুপাখি, জীবজন্তু সকলেই চায়। মানুষের এই বাধ্যতামূলক গৃহ-বন্দিত্ব অনেককে হতাশা ও অবসাদগ্রস্ত করে দিচ্ছে। কেউ কেউ এতটাই ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হয়েছে যে, আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছে। গৃহের মধ্যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি মানসিক দুরত্ব তৈরি হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তার ফলে কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলছে। মানসিক আধি-ব্যাধির কারণে অনেককেই এখন মানসিক চিকিৎসকের কাছে যেতে হচ্ছে। চিকিৎসকরা ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ঔষধের দ্বারা মানসিক ব্যাধি নিরাময় সম্ভব হচ্ছে না। অনেককেই দীর্ঘকালের জন্য বা সারা জীবনের জন্য মানসিক রোগগ্রস্ত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এটি একটি নতুন উপসর্গ। একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতার কারণে সমাজে একটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্যা নতুন কিছু নয়, কিন্তু এমন ব্যাপকতা আগে কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। সেজন্য চিন্তাশীল মানুষকে বিষয়টি ভাবাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে নতুন মহামারী বা অতিমারী করোনাসূত্রে নতুন আকারে যার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, তার থেকে মুক্তির কোন পথ আছে কি? আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় তার সাময়িক উপশম হচ্ছে হয়ত, কিন্তু স্থায়ী সমাধান আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দিতে অপারগ। এক্ষেত্রে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের মধ্যে আমরা একটি নতুন আলো পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন হতাশা এবং অবসাদ থেকে মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। যদি হতাশার মুলোচ্ছেদ করা যায় তাহলে আমরা একটি সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন লাভ করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, গুরুবাক্যে বিশ্বাস এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস মানুষকে একটি স্থির নির্ভরতার ভূমি দান করতে পারে। তাঁকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস আসে কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলতেন, ঈশ্বরের শক্তিতে যদি সন্দেহ আসে তাহলে বুঝতে হবে তোমার সাধনজীবন ঠিক হচ্ছে না। সাধনজীবন যদি ঠিক থাকে, ভগবানের স্মরণ-মনন যদি সর্বদা চলতে থাকে তাহলে অবিশ্বাস সংশয় সেকথা ভক্তদের কাছে আসতে পারে না। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বলতেন, "সর্বদা ইষ্টচিন্তা করলে অনিষ্ট আসবে কোথা থেকে?" বস্তুত, ভগবানের স্মরণ-মনন এমন একটি মহৌষধ যা মানুষকে একটি স্থির প্রত্যয়ের ভূমিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের স্মরণ-মননের পাশাপাশি আরেকটি জিনিসের ওপরও গুরুত্ব দিতেন। তা হল-- আত্মবিশ্বাস বা নিজের ওপর বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "নেই নেই বললে সাপের বিষও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।" কথাটি আমরা স্বামীজীর 'পত্রাবলী'তে পাই। কিন্তু স্বামীজী বলছেন, কথাটি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শুনেছেন।

তিনি যেমন নিখুঁতভাবে প্রদীপের সলতে পাকাতে শেখাতেন, তেমনি আবার সুন্দরভাবে ঝাঁট দিতেও শেখাতেন। তাঁর কোন কাজই অসুন্দর ছিল না। সবই ছিল সুন্দর। যেন একটি শিল্পকর্ম। করোনার সূত্রে এখন বাড়িতে কাজের লোক পাওয়া যায় না। এখন বাড়ির সকলকেই বাড়ির কাজ ভাগ করে করে নিতে হচ্ছে। এই শিক্ষা বাঙ্গালী পুরুষদের মধ্যে বিশেষ দেখা যেত না এতদিন। করোনা তা শিখতে বাধ্য করল।

শ্রীরামকৃষ্ণ দৈব এবং পুরুষকার দুই বিপরীত মেরুর সমন্বয় বা মেলবন্ধন করেছিলেন। তাঁর জীবনের বাণী ছিল সমন্বয়। তিনি বলতেন, "যে সমন্বয় করেছে সে-ই লোক।" এই সমন্বয় শুধু ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই নয়, সমন্বয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই। তা যেমন ধর্মের সঙ্গে কর্মের, তেমনি জাগতিকের সঙ্গে পারমার্থিকের । কর্মই শেষে ধর্ম বা উপাসনায় রূপান্তরিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সেজন্য প্রতিটি কাজকেই ধর্ম বা উপাসনার অঙ্গ হিসেবে দেখতেন এবং সেভাবে দেখার জন্য ভক্তদের উৎসাহিত করতেন। এভাবে তিনি একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন মানুষকে দান করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই শিক্ষাই স্বামী বিবেকানন্দ জগতে প্রচার করেছিলেন। শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর প্রতিদিনের জীবনচর্চায় ও জীবনচর্যায় তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। স্বামীজী সেই জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। নিবেদিতা লিখেছিলেন, এখন থেকে ঐহিক এবং পারমার্থিকের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকল না। এটি ধর্মের অঙ্গ, ওটি ধর্মের বাইরের অঙ্গ এমন বিভাজনের উপদেশ তাঁদের অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ছিল না। সেজন্য এইযুগের বিশিষ্ট দার্শনিকেরা শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনকে 'সমন্বয়ী দর্শন' বলে অভিহিত করেছেন। আজকের করোনাজনিত মহামারী বা অতিমারীর আবহে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাব ও আদর্শ মানুষকে এক নতুন আলোকের দিশা দেখাচ্ছে।

আমরা যখন আমাদের মনোবল হারিয়ে ফেলছি অথবা যখন আমাদের মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের বলছেন --- ভয় পেয়োনা, ধৈর্য হারিও না। তোমার পথে তুমি এগিয়ে যাও, চলতে চলতে কখনও থামবে না, গতির মধ্যেই অবস্থান কর। কারণ গতিই জীবন, জড়তাই মৃত্যু। তিনি এক কাঠুরিয়ার গল্প বলতেন কাঠুরিয়া খুব দরিদ্র । জঙ্গলে কাঠ কেটে সেই কাঠ বিক্রি করে কোনরকমে তার সংসার চলত। একদিন এক সাধু তাকে বললেন, "এগিয়ে পড়।" কাঠুরিয়া সাধুর কথা মনে রেখে যে জঙ্গলে সে রোজ খাট কাটত সেখান থেকে সে আরো এগিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে সে চন্দনের বনে উপস্থিত হল। চন্দন গাছ কেটে এবং তা বিক্রি করে সে অনেক টাকা পেল। ধনী হয়ে গেল। তার সংসারের অভাব মিটল। সে তখন ভাবল সন্ন্যাসী আমাকে তো এগিয়ে যেতে উপদেশ দিয়েছেন, তাই সে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে সে লোহার খনি পেল। তারপর আরো এগিয়ে তামার খনি পেল। তারপর সে আবার এগিয়ে গিয়ে রূপোর খনি পেল। অবশেষে সে আরো এগিয়ে গিয়ে সোনার খনি পেল। তখন সে ধন-সম্পদে একেবারে আন্ডিল হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশের তাৎপর্য হলো --- আমরা যেন কখনো অল্পে সন্তুষ্ট না থাকি। উপনিষদে বলা হচ্ছে, 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্'। অল্পে সুখ নেই, ভূমাতেই সুখ। 'ভূমা' অর্থাৎ বিরাট। তাৎপর্য হলো আত্মতৃপ্তিতে সুখ নেই , সুখ আত্মব্যাপ্তিতে। যত আমরা নিজের হৃদয়ের প্রসার ঘটাব ততই আমাদের সার্থকতা। তাই নিজেকে সংকুচিত না

করে প্রসারিত করতে পারলে আমরা ভাল থাকব। করোনা আমাদের অনেককে স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ করে দিয়েছে। করোনার ফলশ্রুতিতে তা উপলব্ধি করে আমরা এখন নিজেদের ত্রুটি সংশোধন নিজেদের পরিবর্তিত করে নেব। এই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আমাদের হৃদয়কে প্রসারিত করে দেবে। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে পূর্ণের স্ফূলিঙ্গ লুকানো রয়েছে। সেই স্ফূলিঙ্গকে আমাদের অধ্যবসায়ের মাধ্যমে প্রকাশ করে তাকে অনির্বাণ অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত করতে হবে। আমরা আমাদের পথে এগিয়ে যাব। থামব না যতই বাধা আসুক।

বর্তমান পৃথিবীতে করোনার কারণে পরিবারে এবং সমাজে যে বিচ্ছিন্নতার আবহ তৈরি হয়েছে তা মানুষকে নিজের দিকে তাকাতে বাধ্য করেছে। মানুষ শত ব্যস্ততার মধ্যে একটু নিজের দিকে তাকানোর অবকাশ পেয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সবাইকে এক করতে চাইতেন। তাঁর একটি উপদেশ মনে পড়ে। তিনি বলতেন, সবাইকে নিয়ে মিলমেশ করে থাকবে। তাতে যেমন পরস্পরের মধ্যে বন্ধনটি দৃঢ় হবে তেমনি মানসিক শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। ঐক্যের বন্ধন শক্তির একটি বড় প্রেরণা। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথগুপ্ত পিতার সঙ্গে যৌথ পরিবারে বাস করতেন। মাঝে মাঝে পিতার সঙ্গে তাঁর মতান্তর হতো। তা জানতে পেরে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন --- "বাবার সঙ্গে প্রীত্ করে থাকবে।" বাবা-মা গুরুজন। তাঁদের ভূলত্রুটি সংশোধন করার দায়িত্ব সন্তানের নয়। এই উপদেশটি শুধুই কথামৃতকারের জন্যই ছিল না, ছিল আমাদের সকলের জন্যও। করোনার আবহে তা আমাদের স্মরণীয়। তাতে আমাদের মধ্যে 'বন্ডিং' আরো বৃদ্ধি পাবে যা আমাদের মনোবলকে শক্ত করবে।

করোনার আবহে মানুষের আর্থিক অনটন তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে অভাবের তাড়নাও। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই ভক্তদের পরামর্শ দিতেন, কৃপণতা ভাল নয়, আবার অমিতব্যয়িতাও অন্যায়। মিতব্যয়িতাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ। আমরা যেন লোভের বশবর্তী না হই, অর্থের দাস না হয়ে পড়ি, পাশাপাশি গৃহস্থকে সঞ্চয়ের উপদেশও তাঁর ছিল যাতে প্রয়োজনে সেই সঞ্চয় গৃহস্থকে বিপদের সময় সাহায্য করতে পারে। করোনার কারণে শুধু যে সাধারণ মানুষের জীবনেই অনটন এসেছে তা নয়, তার সঙ্গে এসেছে মানসিক দৈন্যও। বিপদের দিনে সঞ্চিত অর্থ যেমন আমাদের নিশ্চিত নির্ভরতা জোগায়, তেমনি আবার মনের সাহস এবং প্রত্যয়ের দৃঢ়তাকেও বাড়িয়ে দেয়। করোনা যে অনটন এনেছে পরিবারে, তাতে সঞ্চিত অর্থ থাকলে আমাদের সুবিধা হবে, এই চেতনা নতুন করে করোনা আমাদের শিখিয়েছে। এই সংযম ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় শিক্ষা করোনার সূত্রেই আমরা পেলাম। তা আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকেই মনে পড়ায়।

বিপর্যয়েরও একটি ইতিবাচক দিক আছে। বিপর্যয় মানেই শুধু নেতিবাচক ভাবনা বা ফল তা কিন্তু নয়। বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি ইতিবাচক দিকও আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তা হল বিপর্যয় আমাদের ভিতরের যে শক্তি যা চাপা ছিল বা অপ্রকাশিত ছিল তাকে বের করে নিয়ে আসে। আমাদের নিজেদের ভিতরের শক্তিকে আমরা তখন আবিস্কার করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'তুই যে শিব রে!' বলতেন, শিব-স্বরূপই তোমার আসল স্বরূপ। তুমি তাঁকে ভুলে আছ, অথবা তুমি তাঁর সম্পর্কে সচেতন নও। আধ্যাত্মিক জগতে গুরু আমাদের সচেতন করার ভূমিকা গ্রহণ করেন। আমাদের জীবনে বিপর্যয় আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে। কতকগুলি ভাল অভ্যেস করোনাসূত্রে আমরা গড়ে তুলতে শিখেছি। করোনা একদিন চলে যাবে, কিন্তু এই ভাল অভ্যাসগুলি আমাদের থেকে চলে গেলে হবে না। সেইগুলিকে আমাদের জীবনে স্থায়ী রূপ দান করতে হবে। যেমন, হাত ধোয়ার অভ্যেস। হাত আমরা ধুতাম, কিন্তু তা আমরা অভ্যাসে পরিণত করিনি। করোনা হাত

ধোয়াকে অভ্যাসে পরিণত করিয়েছে। সচেতনও করেছে। আরেকটি ভাল অভ্যাস করোনা আমাদের শিখিয়েছে তা হলো 'মাস্ক' পরার অভ্যাস। এটি এখন সারা পৃথিবীর অভ্যাস হয়েছে। তবে পাশ্চাত্য দেশেও অনেকে মাস্ক পরার ব্যাপারে 'কেয়ারলেস'। ভারতে তো আরো বেশি। মাস্ক পরা এখন সরকার বাধ্যতামূলক করেছেন। কিন্তু তাতেও সার্বিক সাড়া মিলছে না। এটা যে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন তা আমার প্রায় জানতামই না। করোনাসূত্রে সেটি এখন আমাদের অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের সচেতনতাও এসেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সবসময় খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। সর্বদা খুব পরিপাটি থাকতেন। যখন অঙ্গে তাঁর বসন থাকত, তখন তা একেবারেই ঠিকঠাক থাকত। আবার যখন তা থাকত না তখন এক নিরাবরণ ও নিরাভরণ সৌন্দর্যে তিনি উদ্ভাসিত হয়ে থাকতেন। বরিশালের বিখ্যাত ব্যাক্তিত্ব অশ্বিনীকুমার দত্ত একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরের মধ্যে ভক্তদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করছেন। হঠাৎ একটা সময় ভাবের বশে তাঁর অঙ্গের বসন খসে পড়ল। শ্রীরামকৃষ্ণের যখন খেয়াল হল যে তাঁর অঙ্গে বসন নেই, তিনি পড়ে থাকা কাপড়টিকে কোনরকমে গায়ে টানার চেষ্টা করলেন। অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্যদের সলজ্জভাবে তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাকে অসভ্য মনে করছ?' অশ্বিনীকুমার বললেন, 'কখনই না। আপনি যা করেন তা-ই সুন্দর।' করোনা আমাদের সভ্য হতে শিখিয়েছে ঠিকই, কিন্তু জীবনের ছন্দকে এবং সৌন্দর্যকে অক্ষুন্ন রেখে।

করোনার অন্যতম একটি ইতিবাচক দিক হলো, করোনা আবহে জীববৈচিত্র্য এবং বায়ুমন্ডলের গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। দূষণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। আমাদের পৃথিবী অধিকতর বাসযোগ্যতা ফিরে পেয়েছে। আমাদের পৃথিবীতে ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স রক্ষা পাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তৃণটিকেও মারতে পারতেন না। ভাগ্নে হৃদয় বানের জলে ভেসে আসা একটা বড় মাগুর মাছকে ধরে ঝোল করার কথা বললে শ্রীরামকৃষ্ণ সেটি সঙ্গে সঙ্গে জলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। একটি দুষ্ট ছেলে একটি ফড়িংকে ধরে পীড়ণ করছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ফড়িং-এর যন্ত্রণা নিজের শরীরে অনুভব করেছিলেন। করোনা প্রকৃতির মধ্যে দূষণের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার যে ভূমিকা পালন করেছে তাতে প্রকৃতির জীববৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা আগের থেকে বেশি সম্ভব হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যা করেছিলেন তা আমাদের ভাবায় না কি? জীববৈচিত্র্য রক্ষা করলে পৃথিবীর বাসযোগ্যতা অক্ষুন্ন থাকে। এছাড়া, করোনার প্রাদুর্ভাবে আমরা শিখেছি যে, জগতের যে কোন সমস্যা সম্মিলিতভাবে সমাধানের চেষ্টা করলে তা সহজ হয়ে ওঠে।

নিরপেক্ষভাব চিন্তা করলে দেখতে পাই করোনার অনেক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বৈশ্বিক অতিমারী 'করোনা' আমাদেরকে জগত ও জীবন সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। উদ্ভাবন করতে শিখিয়েছে আমাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে। এই পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ হলো সকল পরিবেশে শিক্ষালাভের জন্য আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত রাখতে হবে। যেন আমদের সকল অভিজ্ঞতা জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবাহক স্বামী বিবেকানন্দ বলতেনঃ 'জ্ঞানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা আমদেরকে সত্যের গভীরে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।' করোনার প্রাদুর্ভাব আমাদের সেই সত্য অনুসন্ধানের সুযোগ করে দিয়েছে।

জগত পরিবর্তনশীল। করোনা সমস্যাও চিরস্থায়ী কোন সমস্যা নয়। আমরা অল্পদিনের মধ্যে করোনার শেষ দেখতে পাব। কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গে এও দেখব যে, করোনা যেমন আমাদের অনেক কিছু নিয়েছে, তেমনি

আবার নতুন করে দিয়েও গেছে অনেক কিছু। আমরা আশা করব আমাদের জীবনে আবার ছন্দ ফিরে আসবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শেখালেন যে, হারিয়ে যাওয়া মানেই শেষ হয়ে যাওয়া নয়। জগতে কোন কিছুই হারায় না । কারণ, সকল কর্মের ফলই অভিজ্ঞতা বা সংস্কার হিসেবে আমাদের অন্তরে বর্তমান থাকে। হারানো শব্দটির মধ্যে পূনরুদ্ধারের ব্যঞ্জনা নিহিত। আমরা হয়ত হারিয়েছি অনেক, কিন্তু পেয়েছিও বেশ কিছু। আত্মীয়-স্বজনের থেকে করোনা আমাদের দুরে সরিয়ে দিয়েছিল। আমাদের প্রায় অসামাজিক করে তুলেছিল। এখন আমরা বুঝেছি আত্মীয়-পরিজন, স্বজন-বন্ধু জীবনে কত মুল্যবান। আমরা আর নতুন করে কিছু হারাতে চাই না।